# কয়েকটি গল্প

নাসরিন সুলতানা সিমা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

# ✍ প্রকাশকের কথা

বাংলা সাহিত্য আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। শত সীমাবদ্ধতা নিয়েই এগিয়ে চলছে আমাদের সাহিত্য যাত্রা। এই যাত্রাপথের অগ্রজরা অক্লান্ত শ্রম দিয়ে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারের বীজ বুনেছেন সযত্নে। আমাদের উত্তরপুরুষদের কলমের ছোঁয়ায় সে বীজ অঙ্কুরোদগম হয়ে বৃক্ষে পরিনত হয়েছে। সমকালীন কলম সৈনিকদের অব্যাহত লেখনিতে সেই বৃক্ষ আজ ফুলে-ফলে সুশোভিত হচ্ছে। এক দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে মায়ের ভাষার শব্দ মিছিল। এ বড় আত্মতৃপ্তির ! এ বড় গর্বের!

অমর একুশে বইমেলা। এক গর্বিত ইতিহাস। বই নিয়ে এমন উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা প্রমাণ করে আমাদের মিছিলের গতিপথ ঠিকই আছে। জ্ঞানরাজ্যে আমাদের প্রজন্ম স্বপ্রণোদিত বিচরণ করছে। প্রয়োজন মিছিলের নেতৃত্বদানকারীদের প্রজ্ঞা ও সঠিক দিক নির্দেশনা। সোশ্যাল মিডিয়ার বৈপ্লবিক উন্মেষের জোয়ারে মলাটবদ্ধ জ্ঞানকে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করার ধরণ ও কৌশল বদলে যাচ্ছে। সময়ের সাথে পাঠকদের রুচি, অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যাচ্ছে। একইসাথে সময় বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে লেখনির ধাঁচও পাল্টে যাচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের লেখক-লেখিকা নিত্য-নতুন ধারনা নিয়ে পাঠকদের চিন্তার রাজ্যকে দ্রুত অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছে। নতুন নতুন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও হাল ধরতে চাইছে শক্ত করে।

এই প্রচেষ্টার একটা অংশ 'কয়েকটি গল্প' গল্পগ্রন্থ। নতুন প্রজন্মের লেখিকা নাসরিন সুলতানা সিমা এখানে বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের গল্প বলেছেন। সমাজে ঘটে যাওয়া দৃশ্যপটকে নিজের মত করে একটি সুনির্দিষ্ট দর্শন ও বিশ্বাস থেকে তুলে ধরেছেন। গল্পগুলো পড়ে পাঠকদের মন:জগতে চিন্তার উদ্রেক হবে বলে বিশ্বাস করি। তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান 'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স' গল্পগ্রন্থটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত পুলকিত ও উচ্ছ্বসিত।

আমরা তরুণ প্রজন্মের চিন্তাশীল ও মেধাবী লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে বদ্ধপরিকর। আমরা বিশ্বাস করি- 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'

ভাষার মাসে আমরা আশা করব, বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে কাজ করতে তরুণরা এগিয়ে আসবে। তাদের ঘষামাজা ও পরিচর্যা করার দায়িত্ব নিয়ে আমরা পরিতৃপ্ত হতে চাই।

লেখিকার প্রথম গল্পগ্রন্থ। নতুন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। দু'য়ে মিলে ভুল-ত্রুটি হওয়া অস্বাভবিক নয়। আশা করছি সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পরবর্তী সংস্করণে আরো যত্নবান হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে চাই। ভাল থাকুন। ভাল কাটুক প্রতিটি ক্ষণ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

# ✍ লেখিকার কথা

শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান রবের দরবারে, যিনি আমাকে লেখালেখির সুযোগ করে দিয়েছেন। জীবনের অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেছি। জমেছে কিছু গল্প। মানুষের জীবনের গল্প। মানুষের জানা-অজানা, আনন্দ-বেদনার গল্প। অক্লান্ত পরিশ্রমে কখনও মানুষ হাসতে ভুলে গেছে। আবার মৃদু আলোর পরশ পেয়ে সেই মানুষই প্রাণ খুলে হাসার চেষ্টা করেছে। কেউ কাঁদে পাওয়ার আনন্দে, আবার কেউবা কাঁদে হারানোর কষ্টে। প্রতিজন মানুষের জীবনে লুকিয়ে আছে অসংখ্য গল্প। সব গল্প হয়তো মোড়কে আবদ্ধ হয় না, তবে থেকে যায় হৃদয়ের মোড়কে আজীবন। সেগুলো থেকেই কিছু বেছে নিয়েছি। কলম দিয়ে সাজানোর চেষ্টা করেছি প্রতিটি লাইন। হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা ঢেলে দেয়ার চেষ্টা করেছি। লেখালেখিতেই প্রাণ খুঁজে পাই। লিখতে গিয়েই উপলব্ধি করেছি সমাজটাকে বদলে দেয়া প্রয়োজন। সমাজের প্রতিটি কোণে যে অসুস্থতা ছড়িয়ে আছে, সেগুলো দূর করা জরুরি। যখন অন্যায়গুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, কলমটাকে তখনই খুব যত্নে লালন করেছি। তাতে হয়তো খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠবে আমাদের চারপাশ। সেই প্রত্যাশা নিয়ে জমানো গল্পগুলো লিখেছিলাম। গল্পগুলো প্রচ্ছদের বর্ণিল ছোঁয়ায় পূর্ণতার দেখা পাবে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। কাছের মানুষগুলোর উৎসাহে আজ সেটা পূরণ হতে চলেছে। সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা!

নাসরিন সুলতানা সিমা

# সূচিপত্র

হৃদয়ের গভীরে / ১১

অস্তিত্বের গল্প / ২০

অসমাপ্ত গল্প / ২৮

প্রতারণা / ৩২

মায়ায় ঘেরা / ৩৮

অন্তরালে অন্ধকার / ৪৩

বিশ্বাস / ৫৬

কাঙ্খিত / ৬৩

বিচ্ছুরিত আলো / ৭৩

অনিশ্চিত গন্তব্যে / ৭৭

ছায়াসঙ্গী / ৮৫

# হৃদয়ের গভীরে

এক

কাঁচের গ্লাসে শিশির বিন্দু জমে আছে। সামনের সবকিছু ঝাপসা। ব্যালকোনির গ্লাস শীতের শুরু থেকেই অমন করে বন্ধ আছে। প্রায় দিনই শিশিরে ভিজে এমন ঝাপসা হয়ে থাকে। পাশেই টেবিলে শ' খানেক বই আলগা পড়ে আছে। দেখলেই বুঝা যায় বইগুলো এতোটাই ব্যবহৃত যে গুছিয়ে রাখার মতো সুযোগ কেউ পায় না। টেবিলের পাশের কর্নারে সবুজ সতেজ পাতাবাহারের ঝালর উপর থেকে ক্রমশ নিচের দিকে নেমেছে। গ্লাসের ওপাশে অনতিদূরে একটা লেক খুব ধীর গতিতে বয়ে চলেছে। টেবিলের পাশে রাখা নরম চেয়ার টেনে বসলেন এক মহীয়সী। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। চশমার চারপাশের মুখমণ্ডলে বার্ধক্যের প্রবল ছাপ। অনেকগুলো দাঁতই হারিয়েছেন। পরনে লম্বা গাউন। সাদা চুলগুলোর ফাঁকে দু-একটা কালো চুল দেখা যায়।

হোম মেইড মেয়েটি কাজ শেষ করে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলো। মহীয়সী নিজের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখলেন, মারিয়া ডি কষ্টা। পাশে আরো একটি নাম মারিয়া হোসাইন। হোম মেইডের সামনে ধরে বললেন- পড়ো।

হোম মেইডের দৃষ্টি জুড়ে বিস্ময়! শিক্ষিতা হোম মেইড দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠলো- 'এটা কী করে হয় ম্যাম? আপনি কি খৃষ্টান ছিলেন?'

গাম্ভীর্যপূর্ণ 'হ্যাঁ' সূচক মাথা দোলান বৃদ্ধা। নেমে যাওয়া চশমাটি ঠিক করে পরেন। ভারী গলায় বললেন- 'ছিলাম! বাবা মায়ের কলিজার টুকরো একটিমাত্র সন্তান ছিলাম আমি। শৈশব কেটেছে লন্ডনে। পরে বাবার চাকুরীর কারণে ইন্ডিয়াতে চলে আসি।

সে প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। বিয়ে করেছিলাম এক ভারতীয় হিন্দুকে। বাবা-মা মেনে নেননি। নিজ ধর্ম বিসর্জন দিয়ে অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করা যেকোন পরিবার, সমাজ ও ধর্মের জন্য ভয়াবহ পাপের! শ্বশুরবাড়ি থেকেও কেউ মেনে নেয়নি। স্বামীর সাথে গাছতলায় থাকবো বলে প্রতিজ্ঞা করলাম।

দু'জন মিলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। ক্ষুধা পেলে ঘাস লতাপাতা যা পেয়েছি, এই দাঁত দিয়ে চিবিয়েছি। কখনো মন্দিরে ঘুমিয়েছি, কখনো গীর্জায়। বিশ্রাম নিয়েছি কখনো গাছের ডালে,

কখনো খোলা আকাশের নিচে। তখন শীতকাল ছিলো। শীতের প্রকোপে চেহারা এতটুকু প্রায়। তখন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি শীতার্তদের যন্ত্রণা, ক্ষুধার্তদের হাহাকার, পিপাসার্তদের আহাজারি!

একদিনের ঘটনা শোনো...। কথা শেষ না করেই হোম মেইডের দিকে তাকান মারিয়া হোসাইন। বললেন- 'লাঞ্চের প্রস্তুতি শেষ করেছো?'

-'জ্বি ম্যাম। লাঞ্চের প্রস্তুতি শেষ। আমি অতি আগ্রহে আপনার পরবর্তী ঘটনা শুনতে অপেক্ষা করছি!'

মারিয়া হোসাইন হাসেন। তার হাস্যোজ্জ্বল মুখে যেন নিরন্তরের গল্প। বললেন- 'তোমার নাম কি যেন? দেখেছো এতো এতো স্টোরী, পোয়েট্রি, কোটেশন, হাদিস মাথায় স্থান গেঁড়ে আছে যে তার ভীড়ে তোমার নামটা রেখে দেয়ার জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না। আর নাম বলতে মনের পুরোটা জুড়ে একটা মাত্র নামই... যাই হোক তুমি কি কষ্ট পেলে?'

- 'জ্বি না, ম্যাম। বলুন প্লিজ। আমার নাম সামিয়া।'

- 'ও আচ্ছা, ঠিক আছে শোনো তাহলে। মন্দিরের এক কলতলায় গোছল সেরে ভেতরে ঢুকছিলাম। ততদিনে ঐ মন্দিরই আমাদের ঘর, সংসার, সমাজ। সবকিছু। মাঝে মাঝে অনেকেই পূজো দিতে আসতো, বিভোর হয়ে দেখতাম। কত লোক আসে, কত লোক যায়। শুধু আমরা দু'জন থেকে যেতাম। আসা-যাওয়ার মিছিল দেখেই ভাল লাগা খুঁজে নিতাম। একদিন আমার স্বামীর মা আসলেন ... একটু শ্বাস নেন মারিয়া হোসাইন। স্বামীর নামটাই তো বলিনি তোমায়, শুনবে না?'

- 'জ্বি শুনবো, আপনি বিরতি দিলে এই প্রশ্নই করতাম।'

- 'হুম, ওর নাম প্রসেনজিৎ সেন। শাশুড়িমা ছেলেকে দেখতে পেয়ে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অনেকক্ষন ধরে কাঁদলেন। বললেন- খোকা তুই এখানে, তোকে কত খুঁজেছি বাবা। অনেকটা সময় পেরিয়ে যায় ছেলেকে ছাড়েন না তিনি। বুঝতে পেরেছিলাম মা-ছেলের জমানো কথাগুলো আজ বের হয়ে আসছে অবিরাম। আমি কেমন অপাংক্তেয় এক প্রাণী যেন। নিজেকে সে সময় খুব অসহায় মনে হচ্ছিল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছিল মুহূর্তেই। মনে হলো কতদিন আমায় কেউ অমন মমতায় জড়িয়ে রাখেনি। বাবার প্রিয় মুখটা মনে পড়লো, সাথে মায়েরও। মেয়ে বলে কি না, তখন আমারও বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। ভাবছিলাম, বাবা জড়িয়ে ধরে বলতো- আমাকে একা ফেলে বেশ আছিস না? মা-ছেলে বেশ কিছুক্ষণ কথা হলো। শাশুড়িমা আমার সাথে কোন কথা না বলেই পূজো সেরে চলে গেলেন। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দেখছি- শাশুড়িমা চলে যাচ্ছেন। এগিয়ে গিয়ে কিছু বলার সাহস হলো না।'

## দুই

এক সপ্তাহ পর। প্রসেনজিৎ আমাকে খুব বেশি ভালোবাসতে শুরু করলো। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম। ভেতরটায় এমন একটা অনুভূতি তৈরি হল, যা বলে শেষ করার মতো না। ওকে বললাম - তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও যে মৃত্যুর মতো মনে হবে। ও তখন মলিন হেসে বলল- কিছু মুহূর্তের জন্য তো ছাড়তেই হবে। একটু থেমে ... আমাদের অন্তত একটি কামরা থাকবে, যেখানে একসাথে ঘুমাবো, ভোরবেলা জেগে দু'জন দু'জনের ঘুম জড়ানো মুখটা দেখবো। আমি ওকে থামিয়ে দিলাম। রাজপ্রাসাদসম বাড়িতে মানুষ হওয়া এই আমার তখন একটি কামরা নিয়ে স্বপ্ন দেখাও যেন খুব বেশি কিছু মনে হচ্ছিল। গত রাতের অবশিষ্ট খাবার দু'জনে ভাগ করে খেয়ে নিলাম। এরপর প্রসেনজিৎ প্রতিদিনের মতো বের হয়ে গেল কাজের খোঁজে। কিন্তু সেদিন সে ফিরেনি। আর কোনদিনই ফিরে আসেনি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন মহীয়সী। তাকান সামিয়ার দিকে। সামলে নিয়ে বললো- চলো নামাজ সেরে লাঞ্চ করি।

- 'জ্বি ম্যাম, তবে পরের ঘটনার জন্য উদগ্রীব থাকবো, বলেই মুচকি হেসে দেয় সামিয়া।'

- 'ওকে।' মলিন কণ্ঠ মারিয়া হোসাইনের।

অত্যন্ত প্রশান্তচিত্তে যোহরের নামাজ আদায় করলেন। মারিয়া হোসাইন সামিয়াকে সাথে নিয়ে একই টেবিলে একই খাবার খেতে পছন্দ করেন। সামিয়া প্রথম দিকে সংকোচ করতো, পরে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

পড়ন্ত বিকেল। শীতার্ত রুক্ষ এই আবহাওয়া সবসময় মারিয়া হোসাইনকে শূন্যতার শিক্ষা দিয়ে জানান দিয়েছে এই পৃথিবীতে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য থেকে যে বিচ্যুত হবে, সে কখনই পূর্ণতার দেখা পাবে না। বরং ধীরে ধীরে শূন্যতার শেষ অবধি পৌছে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কখনো হয়তো টেরই পাবে না। কতোটা মূল্যবান অবস্থান সে হারিয়েছে যা কখনো ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। শূন্য দিগন্তে দৃষ্টি মেলেন মারিয়া হোসাইন। সেখানেও কেবল শূন্যতার সৌন্দর্য দেখতে পান। অনুধাবন করেন শূন্যতার এক আলাদা টান আছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। শূন্যতারও মালিক আছে। এক নিমেষেই যিনি শূন্যতাকে পূর্ণতায় ভরিয়ে দেন। সেই মালিকের কাছে আজ মারিয়া হোসাইন কিছু যেন চায়। জীবনের পূর্ণতা!

সামিয়া কফি নিয়ে ছাদে আসে। আনমনা মারিয়া হোসাইন টের পাননি। সামিয়া সামনে ছোট্ট একটা টেবিলে কফির মগ রেখে দেয়। ওর হাতেও একটা। দরদভরা কণ্ঠে ডাকে, -ম্যাম!

ওর মুখের দিকে তাকান মারিয়া হোসাইন। চশমা খুলে চোখ মুছতে শুরু করেন, হাসার চেষ্টা করেন। বলেন-এসেছো? টেরই পাইনি। আছরের নামাজ পড়েছো?

-জ্বি ম্যাম। আপনাকে এখানে রেখে গিয়ে আগে নামাজ পড়ে নিয়েছি। তারপর কফি বানিয়েছি।

-ম্যাম এখন কি পরবর্তী ঘটনা বলবেন? কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন -'হুম বলবো তো বটেই।'

একটু চুপ থাকেন আরো কয়েকবার চুমুক দেন কফির কাপে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শুরু করেন মলিন কণ্ঠে- 'ফিরে গিয়েছিলাম বাবা মার কাছে। বাবা মা মেনে নিতে চাইলেও খ্রিষ্টীয় সমাজ মেনে নেয়নি। তাড়িয়ে দিয়েছিলো। সেই তাড়ানোর দৃশ্য দেখে ফেলে হোসাইন। আমার আত্মার স্পন্দন, প্রতিটি মুহূর্ত যাকে আমি অনুভব করি। সে ছিলো মুসলিম। এভাবে বিপর্যস্ত একজন নারীকে ফেলে সে চলে যেতে পারেনি। ও সেদিন বলেছিল, -'আপনি চাইলে আমি আপনার সহযোগিতা করতে পারি।'

বাইরের কারো এমন কথা শুনে আমি আরো বেশি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। কিন্তু কি কারণে যেন ওর কথায় আস্থা খুঁজে পেয়েছিলাম। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলাম। অকস্মাৎ ওর আচরণে কান্না থেমে যায় আমার। স্তম্ভিত হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি জড়িয়ে ধরার সাথে সাথে ও খুব দ্রুত আমার বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পেছনে কয়েক ধাপ সরে গিয়ে বলেছিল- আমি মুসলিম!

আমার স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লাগে। ভাবছিলাম, কোন যুবক অসম্ভব সুন্দরী একজন নারীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কিসের টানে? আর তাছাড়া আমাদের সমাজে এভাবে ছেলেমেয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরা কোন ব্যাপারই না। বরং এটাই স্মার্টনেস।

স্বাভাবিক হয়ে বললাম, -'আপনার সাহায্য প্রয়োজন আমার।'

ও আমাকে একটা মহিলা হোস্টেলে নিয়ে যায়। সেখানে থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়। হাতে দশটা বই ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলো, -'আমি প্রসেনজিৎকে চিনি। ওদের পাড়াতেই থাকি, প্রতিবেশী হিসেবে ওর সব ব্যাপারে জানি। ও গতকাল বিয়ে করেছে...আমি আবারও কেঁদে ফেলি। আমার প্রসেনজিৎ বিয়ে করেছে আবার...। ও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, -'আপনাকে যে বইগুলো দিয়েছি ওগুলো পড়বেন। দেখবেন দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে। আপনি নিজেকে জানবেন। নিজের করণীয় বুঝতে পারবেন। কষ্টগুলোও হালকা হয়ে যাবে'।

আমি হঠাৎই ওকে প্রশ্ন করেছিলাম- 'আপনি কি আসবেন মাঝে মাঝে?'

-'না তা সম্ভব হবে না। বরং বইগুলো পড়া শেষ হলে হোষ্টেল প্রধানকে জানাবেন। আরো বই পাঠিয়ে দিব। আর মাসিক যাবতীয় খরচ পাঠিয়ে দিব। যতদিন আপনার আয়ের কোন ব্যবস্থা না হয়। ও সেদিন চলে যায়।

আমি বইগুলো নেড়ে দেখি। একটা বইয়ে দৃষ্টি আটকে যায়।

'বাইবেল ও কুরআন!'

তিন

সামিয়াকে সাথে নিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করেন মারিয়া হোসাইন। এরপর আবার শুরু করেন।

-'আমি ঐ হোস্টেলে দুই বছর থেকেছি। দুই বছরে প্রায় ছয়শত বই পড়েছি। সব বইই হোসাইন পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একদিনও আমার সাথে দেখা করেনি। আমি প্রতিদিন অপেক্ষা করেছি। ও আসেনি। আমি একদিন খবর পাঠালাম দেখা করব বলে।

কিন্তু ও বলে পাঠিয়েছিলো- 'দেখা করার মতো কোন প্রয়োজন আমাদের থাকতে পারে না'।

বইগুলো পড়ে আমার চিন্তার রাজ্যে বিরাট পরিবর্তন আসলো। সিদ্ধান্ত নিলাম মুসলমান হবো। দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলাম। হোসাইনের বাড়ি থেকে আমাকে ডেকে পাঠায় ওর বাবা-মা। আমি যাবার পরে বললেন- আমার জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান আংকেল-আন্টি। একটা ছেলেও দেখে রেখেছে। ইঞ্জিনিয়ার। সেদিনও হোসাইন সামনে আসেনি। খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। অনেক কথা বলার ছিলো, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিলো বলে ফিরে এসেছিলাম। এরপর একটা জব পেয়ে যাই সোশাল মিডিয়া নামে এক গবেষণাগারে। এভাবেই চলছিলো। হোসাইনের বাবা-মা'র দেয়া বিয়ের সে প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম-

'আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বিয়ে করব না। আপনাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার নতুন জীবনের জন্য। একজন মুসলিম হিসেবে পরিচিত হতে পেরে আমি গর্বিত। হোসাইনের দেয়া বইগুলো আমাকে সব ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে সরল-সোজা পথের দেখা দিয়েছে। সশ্রদ্ধ সালাম আপনাদেরকে।'

ইতি
মারিয়া

এভাবেই চলছিলো। হঠাৎ একদিন শুনলাম হোসাইন হাসপাতালে। পাগলের মতো ছুটে ওর কাছে গিয়েছিলাম। মনে পড়ে সেদিন একটা অটোর সাথে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যাই। ভাগ্য ভালো ছিলো। ফুটপাতে পড়ে গিয়েছিলাম। হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম ওর ব্রেইনে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বাক্যটা শোনার সাথে সাথে আমার পুরো পৃথিবী যেন উলট-পালট হয়ে যায়। একটু নির্জন স্থান খুঁজে নিয়ে চিৎকার করে কেঁদেছিলাম। শুধুই মনে হচ্ছিলো, হোসাইনের সাথে আমার থাকা না হোক, কিন্তু এই পৃথিবীতে কোথাও সে থাকবে না এটা কি করে আমি মেনে নেব? সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে বিয়ে করার। ওর বাবা-মাকে নিজেই নিজের ইচ্ছেটা জানালাম। ওর এই কষ্টকর সময়গুলোতে পাশে থাকার

আকুতি জানালাম। ওনারা আপত্তি জানিয়ে বলেন, -'নাহ! এ কি করে সম্ভব? এ সময় বিয়ের কথা? আর তাছাড়া তোমার সামনে অনেকটা পথ। না, না। আমরা তোমার জীবন নষ্ট করতে পারি না।'

আমার অবস্থান দেখে ওনারা সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। নতুন সমস্যা হলো হোসাইন কোনভাবেই রাজি হচ্ছিল না। পাঁচদিন পর সে সম্মতি দেয়। হাসপাতালেই বিয়ে হয় আমাদের। সেদিন অসংখ্য রোগী, ডাক্তার, নার্স আমাদের বিয়েতে জমায়েত হয়েছিলো। সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন।

## চার

এরপরের ঘটনা শুধুই ভালোবাসার। হোসাইনের জন্ম ছিলো বাংলাদেশে। কিন্তু বেড়ে ওঠা ভারতে। হোসাইনের ইচ্ছেতেই আবার বাংলাদেশে ফিরে ওর পরিবার। সাথে আমি। ওর দাদু লাউয়াছড়া রেইন ফরেস্টের এই বাংলোটা চাকরি সূত্রে পেয়েছিলেন। পরে স্থায়ীভাবেই তাকে দিয়ে দেয়া হয়। সবাই মিলে এই বাংলোতেই উঠি। হোসাইনের আমার ভেতরটাকে প্রশান্ত রাখতো সবসময়। ওর প্রসঙ্গ উঠলে, ওকে দেখলে মনে মনে একটা কথা উচ্চারিত হতো- এই মানুষটাকে আমি খুবই ভালোবাসি।

ও শেষ ক'টা মাস আমাকে এতো সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত উপহার দিয়েছে, যে মুহূর্তগুলোকে আঁকড়েই আমার এই পুরো সময় কাটিয়ে এসেছি। লাউয়াছড়া আসার দু-তিন দিন পর হঠাৎ শুনি সবাই যশোর চলে যাবে। ওখানে গ্রামের বাড়ি। সবার মতো গোছগাছ শুর করেছি আমিও। সবাই রেডি। আমিও রেডি হচ্ছি। হোসাইন এসে আমার মাথায় আটকানো ওড়না একটানে খুলে ফেলে পেছন থেকে আমায় জড়িয়ে ধরে বললো-

-'আমাকে এখানে একাকী ফেলে চলে যাচ্ছো'? আমি ওর স্পর্শে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিলাম। অবাক হলাম। বললাম- বুঝিনি তোমার কথা।

-'আমি যশোর যাচ্ছি না!'

-'কেন?'

-'বাবা মা আপু সবাই তোমাকে আর আমাকে কিছুদিন একাকী সময় দিতে চেয়েছেন তাই!;

ওর বাক্য শেষ হয় না। আমি আনন্দে আত্মহারা! শক্ত করে জড়িয়ে ধরি ওকে।

সবাই চলে গেলেন। শুধু আমরা দু'জন। অনেকটা হানিমুনের মতো। সময়গুলো খুব দ্রুতই চলে যাচ্ছিলো।

থেমে যান মারিয়া হোসাইন। এরপরের আর কিছুই বলব না তোমায়। খুব যন্ত্রণার কথাগুলো বর্ণনা করি না। বর্ণনা করা যায় না। শুধু একটা কথা বলি সামিয়া। আমি যখন থেকে হোসাইনের সততা দেখেছি, চোখ বন্ধ করে ওকে ভালোবেসেছি। ওর মতো মানুষকে কখনো ভালো না বেসে থাকা যায় না। ওর প্রতিটি ইবাদাত খুব যত্নে পালিত হতে দেখতাম। ওকে দেখে শিখেছি মানুষের সৌন্দর্য তার কাজে, তার দৃষ্টির পলকে, তার মুখের কথায়। এগুলো সুন্দর হলে আপনাতেই তার দৈহিক অবয়বকে পছন্দ করা যায়। যদি সে সুন্দর না হয় তবুও।